‘বয়স হচ্ছে গান হচ্ছে না যখন তখন মনে হয় ফুলস্টপ টানার সময় হয়ে গেছে’

অঞ্জন দত্ত

অঞ্জন দত্ত ভিন্নধারার গায়ক। সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। এই ফাঁকে জুলফিকার রাসেলের কথায় বাপ্পা মজুমদারের সঙ্গে একটা ডুয়েট অ্যালবামের কাজ শেষ করে গেলেন। অ্যালবামের নাম ‘ইচ্ছে করেই একসাথে’। ২৫ নবেম্বর রাত ১১টায় হোয়াইট হাউজ হোটেলে সাপ্তাহিক ২০০০-এর মুখোমুখি হন। সিনেমা, গান নিয়ে কথা বলেন... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাইফুল হাসান** ও **রুহুল তাপস**

সাপ্তাহিক ২০০০ : অঞ্জন দত্ত গায়ক, অভিনেতা এবং পরিচালক। শিল্পের এতোগুলো মাধ্যমে একসঙ্গে কাজ করছেন। এটা কিভাবে সম্ভব? আপনার শুরু অভিনয় দিয়ে, তারপর গানে... আবার পরিচালনায়...।

অঞ্জন দত্ত : সহজভাবে বলতে গেলে, আমি কোনো সময় গানের লোক ছিলাম না। বরাবরই সিনেমার লোক। বরাবরই সিনেমা করতে চেয়েছি। আমি গানে এলাম ’৯৩ সালে। তার আগ পর্যন্ত কিন্তু সিনেমার পেছনেই ছুটেছি। ’৯৩-এ সুমনের গান শুনে উৎসাহিত হলাম। তার হাত ধরে গানে এলাম। গান শুরুর আগে কখনো মনে হয়নি গান আমার কেরিয়ার হবে। কারণ গানকে তো কেরিয়ার করতেই চাইনি। সুমনের গান প্রচলিত গানের ফর্ম ভেঙে দিলো। এ গান গণসঙ্গীত নয়, আবার জীবনের কথা বলে, কষ্টের কথা প্রকাশ করে, গানে ভালোবাসার আকুতি যেমন আছে তেমনি স্যাটায়ারও আছে। এই কষ্ট, অভিমান, যন্ত্রণা সব মানুষের আছে। সেটাই আমি লিখলাম। গল্পের ফর্মে লিখলাম। তারপর সুর দিলাম, গাইলাম। একদিন পারফর্ম করলাম। দেখলাম মানুষ আমার গান পছন্দ করছে। গান দিয়ে আমি একটা বিশাল অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছাতে পারছি, যেটা সিনেমায় পারিনি। তো সুমনের বা আমার গান শুধু গান নয়। সাধারণ ফর্মে গান আনন্দ বা বেদনা বা দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটায়। কোনো মন্তব্য করে না। কিন্তু আমার গান মন্তব্য করলো, সমকালীন হলো অর্থাৎ গান নিজস্ব একটা মাত্রা পেলো। গান শুধু গান থাকলো না। আমার, আপনার অপূর্ণতা, গ্লানি, না বলতে পারা কথাগুলো গানে উঠে এলো। এভাবেই অঞ্জন দত্ত গায়ক। কিন্তু আমার শুরু তো গানে নয়, সিনেমায়।

২০০০ : সেখান থেকেই শুরু করেন না?

অঞ্জন দত্ত : দেখেন, আমি বেড়ে উঠেছি ’৭০-এর দশকে। শুরু থেকেই বাংলা থিয়েটার, সাহিত্য ও সিনেমার মাঝে থাকতে চেয়েছি। আগেই বলেছি, গান গেয়ে জনপ্রিয় হবো আমার কোনো সময়ই এমনটা মনে হয়নি। তারপরও গানে আসতে হলো। কারণ সিনেমা। আমি যে ধরনের ছবিতে অভিনয় করি, সে রকম ছবি বছরে একটি-দুটি নির্মাণ হয়। একটা ছবি করতে সময় লাগে তিন মাস। বাকি সময় কি করবো? বাঁচতে হবে, এর জন্য তো অর্থ প্রয়োজন। কিন্তু একটা ছবি করার পর পরবর্তী ছবির জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা। এ সময়টা নিয়ে বড় চিন্তিত ছিলাম। বাঁচতে হবে, এটাই জীবনের মূল বাণী। তো হলো কি, এ সময় আমি শুধু রোজগারের জন্য সাংবাদিকতা করেছি, বিজ্ঞাপন করেছি, স্ক্রিপ্ট লিখেছি, টেলিভিশনে কাজ করেছি। কিন্তু কোনোটাই আমার মনঃপুত হচ্ছিলো না। কারণ আমাকে সিনেমা করতে হবে। পরবর্তী ছবির জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আজেবাজে সিনেমায় অভিনয় করেও আমি আয় করতে পারতাম। আমি তো আজেবাজে সিনেমায় অভিনয় করবো না। এটা নৈতিকতার ব্যাপার। সিনেমার কাজ যখন থাকে না তখন সুস্থ রুচিসম্মত কাজের মধ্য দিয়ে রোজগার করতে চেয়েছি। বলতে পারেন, গান আমাকে এই সুযোগটি দিয়েছে।

‘মেরিয়েন, রমা, মালা আমার আপনার জীবনেই আছে। এ রকম অনেক গল্প আপনার বা আপনার বন্ধুর জীবনে আছে। আমার বন্ধুদের জীবনেও আছে। মন্টু-রীতার মতো বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়েই সকলের জীবন। লিখতে বসলে ওদের কথাই যে মনে হয়। জীবন সমৃদ্ধ হবার পেছনে এসব বন্ধুদের ভূমিকাও তো কম নয়। ওরা ঐ সার্কেলেরই অংশ’

এ ব্যাপারটি আমাকে দারুণ প্রভাবিত করেছে। এরপর তো অনেক গান করেছি। যা হোক, কোলকাতায় আমার ছবি কম লোকই দেখেছে। সে ছবিগুলো বিদেশে গেছে, পুরস্কার পেয়েছে। আর্ট হাউজে দেখানো হয়েছে। আমি মানসম্মত সিনেমা করতে চেয়েছি সারা জীবন। এখানে কোনো আপোস করিনি।

২০০০ : ফিল্মের বাইরে যখন গান বা স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়ে মনোযোগ দিচ্ছেন, তখন সিনেমায় মনোযোগ কমে আসছে কি?

অঞ্জন দত্ত : আমার সব সময় উল্টোটা মনে হয়। আমার মনে হয় যদি সিনেমা করতে হয় তবে এমন ছবি করবো, যেগুলোকে গুণগত জায়গা থেকে শ্রদ্ধা করতে পারি। ফিল্ম স্টার বলতে যেটা বোঝায় সেটা কখনো হতে চাইনি। শিল্পসম্মত-রুচিসম্মত সিনেমা করতে

'এরা আপনাদের কাছে সুন্দর কারণ আপনার কল্পনায় এই নারীটি আছে। আমার গানের নায়িকারা সবাই কিন্তু সাধারণ। এরকম সাধারণ নারীকে নিয়েই তো আপনার স্বপ্ন সুরের মতো মিষ্টি হয়। আরো একটা ব্যাপার হলো, এ গানগুলো জনপ্রিয় হবার পেছনে মানুষের কম সাইকোলজি কাজ করেছে। একজন যুবক হয়তো এ রকম একটা গল্প বলতে চাচ্ছে'

চেয়েছি। ফর্মুলায় বাঁধা সিনেমা আমার কাছে ভালো সিনেমা নয়। যদিও এখন পর্যন্ত ফর্মুলা রিডেন ছবি বেশি হচ্ছে। ভালো সিনেমা, একেবারে অন্য রকম সিনেমা করবো বলে, সিনেমা নিয়ে পড়াশুনা করেছি। প্রচুর ছবি দেখেছি। সিনেমা আমার কাছে শুধু টাকা-পয়সা আয়ের জায়গা নয়, এটা শিক্ষার জায়গা। নিজের কাজের গুণগত মান রাখার জন্যই আমাকে খানিকটা গান ও অন্যান্য কিছু করতে হচ্ছে। যাই করি না কেন, একেবারে ফ্রেমে বাঁধা কিছু করতে চাইনি। গান যখন করেছি তখন সেটা ভিন্ন ধারার গান। আমি যদি শুধু ভোকালিস্ট হতাম তাহলে আমাকে কিন্তু বাজে গান করতে হতো। গান আমার কাছে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের জায়গা। এটাই আমি শ্রোতাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চেয়েছি। এ ব্যাপারে সম্ভবত সফল। মানুষ আমার কথা শুনছে এবং শুনতে চাইছে। আমার মনে হয় কাজ করেছি কম কিন্তু মানসম্পন্ন। যে জন্য শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম বেছে নিতে পেরেছি। যেমন সাংবাদিকতা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। আমি শুধু গান গাইলে তো শিখতে পারতাম না। আমার মনে হয় 'যে ভাত রাঁধে সে চুলও বাঁধে'।

২০০০ : আপনি অভিনেতা থেকে পরিচালনায় আসলেন কি করে?

অঞ্জন দত্ত : আমি সিনেমায় অভিনয় নয়, পরিচালক হতে চেয়েছিলাম। পরিচালক হওয়ার জন্য কেউ আমাকে টাকা দেয়নি। আমি অ্যাসিস্টেন্ট পরিচালক হিসেবে কোথায় গিয়ে কাজ করবো? টালিগঞ্জে যেসব ছবি হচ্ছে সেখানে? টালিগঞ্জের সিনেমা থেকে তো কিছু শেখার নেই। আমি চেয়েছি সিনেমা বানাতে কিন্তু পরিচালকরা আমাকে অভিনয় করার জন্য ডাকে। তখন ভেবেছি, ছবি করতে হলে আমাকে এই পথেই এগুতে হবে। তখন অভিনয়ের পাশাপাশি তাদের হাত ধরে পরিচালনায় আসতে চেয়েছি। এরপর অপেক্ষা করেছি কবে কে টাকা দেবে, সেদিন ছবি বানাবো। সিনেমা তো ইচ্ছে করলেই বানানো যায় না। এজন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। সে সময় আমাকে সহযোগিতা করেছে গান। তা না হলে এতো দূর আসতে পারতাম না। '৯৭তে প্রথম সিনেমা পরিচালনা করি, হিন্দি ছবি, 'বাড়াদিন'। এরপর আরেকটি ছবি পরিচালনার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আরো ছয় বছর। কারণ পয়সা, গল্প, আরও অনেক কিছু দরকার। সিনেমায় আপোস যেন না করতে হয় সে জন্যই গান করেছি। ২০০৩-এ একসঙ্গে দুটো ছবি করেছি। একটি ইংরেজি 'Bou barak forever' (বৌ ব্যারাক ফরএভার), অন্যটি এখনও রিলিজ হয়নি। 'ছয়' বলে একটা বাংলা ছবি। আমি এবং ছয়জন পরিচালক মিলে করি ছবিটা।

২০০০ : ভারতে তো এখন অনেক পরীক্ষামূলক ছবি হচ্ছে। সামাজিক সমস্যা, প্রতিবন্ধিত্ব, নাগরিক দ্বন্দ্ব, পররাষ্ট্রনীতি- সব বিষয়েই ছবি হচ্ছে। তাহলে আপনি যে ধরনের ছবির কথা বলছেন, সে রকম ছবি তো হচ্ছেই...

অঞ্জন দত্ত : এক্সপেরিমেন্টাল ছবি হচ্ছে না তা বলছি না। এক্সপেরিমেন্টাল ছবির চেষ্টা অনেকেই করছে। কিন্তু সংখ্যা বা সাফল্যের পরিমাণ কম। পুরো ভারতে বছরে ৮০০-র মতো ছবি হচ্ছে। কিন্তু ভালো ছবি কই? হলিউডের পর ভারতেই সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্র তৈরি হয়। কমার্শিয়াল ছবি তো হবেই। সে তুলনায় সিরিয়াস ছবির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার কথা। সেটাই হচ্ছে না। ভারতীয় সিনেমার দর্শক তো শুধু ভারতবর্ষেই নেই; আমেরিকা, ইউরোপসহ সারা বিশ্বেই দর্শক রয়েছে। এসব দর্শকের জন্যও তো ভালো ছবি করা দরকার, সেটাও হচ্ছে না। '৬০-৭০-এ আমরা যত সাবজেক্টিভ, যত ভালো চলচ্চিত্র পেয়েছি, এখন সেটা পাচ্ছি না। এ ক্রাইসিসটার কথা বলছি।

২০০০ : যেসব ছবি হচ্ছে সেসব দর্শকরা দেখছে। এসব ছবি ভালো ব্যবসাও করছে। তাহলে সমস্যা কোথায়?

অঞ্জন দত্ত : বছরে কতোটা ছবি ব্যবসা করছে খোঁজ নেন। ৮০০ ছবির মধ্যে ১০টা ছবি ভালো ব্যবসা করলে তা ভালো ব্যবসা বলবো না। সেই একই ফর্মুলা। হ্যাঁ, আমি মানছি বাণিজ্যিক ধারার ছবি সব সময় বেশি নির্মিত হবে। বাণিজ্যিক ধারার বাইরেও তো ছবি হচ্ছে। এসব ছবিও তো ব্যবসা করছে। আমি বলতে চাচ্ছি, আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে ভালো ছবি হচ্ছে না। যা '৬০-৭০-এ হয়েছে।

২০০০ : '৬০-৭০-এর কথা যদি বলেন তবে তো বলতে হয় ঐ সময় বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সময়। গান, সিনেমা, চিত্রকলা, সাহিত্য সব শিল্পের ক্ষেত্রে এটা বলা যায়। সময়ের দাবিতে সারা বিশ্বেই একটা জেনারেশন এসেছিলো। যারা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলো, মানুষকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছিলো। আজ ৪০-৫০ বছর পরে এসে তেমন কিছু আশা করা তো যৌক্তিক নয়। সময় বদলেছে, প্রেক্ষাপটও ভিন্ন। তাই...

অঞ্জন দত্ত : এজন্যই তো আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে ভালো ছবির কথা বলছি। ছবি দেখে শুধু চিত্তবিনোদন হবে, দুঃখ হবে এমন চলচ্চিত্র নয়। যে চলচ্চিত্র আপনাকে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করবে, প্রশ্ন করতে শেখাবে, মানবিক হতে শেখাবে। প্রত্যেক জেনারেশনের কাছেই তার সময় শ্রেষ্ঠ। তারপরও অস্বীকার করি না, '৬০-এর দশকটা সত্যিই অন্য রকম। আলাদা শ্রেষ্ঠত্ব এ দশকের আছে। ঐ সময়ে সারা বিশ্বে ভালো ছবি, গান, কবিতা, নাটক হয়েছে। কিছু মানুষ সেটা করেছে। তখন তো এতো উন্নত প্রযুক্তি ছিলো না, তবুও হয়েছে। গোটা বিশ্বে তখন জাগরণ। আমেরিকায় বব ডিলান, এলেন গিন্সবার্গ, জন লেননের মতো গীতিকার এসেছে। বাংলাদেশেও তখন সেরারা বেরিয়েছে। তারা তাদের সময়ের সমস্যা ও সম্ভাবনাকে ফোকাস করেছে। আমাদের আধুনিক করেছে। কিন্তু এখন আমরা নিজেদের ক্রইসিসটাকেই ফোকাস করতে পারছি না। যদি করতে পারি তবে আমরা ভালো ছবি নিশ্চয়ই বানাতে পারবো। কিন্তু সমস্যা কি জানেন? আধুনিকায়ন আর বিশ্বায়নের নামে আমরা নিজেদের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের জায়গা ভেঙে ফেলেছি। এখন আমরা কনফিউজড্। এই ক্রাইসিসে আমরা গুলিয়ে যাচ্ছি। কোনোভাবেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছি না।

২০০০ : সারা বিশ্বেই তো একই অবস্থা।

আমেরিকা, ফ্রান্সে বছরে কতোটা ভালো ছবি হয়? তাহলে ভারতবর্ষের কথা আলাদাভাবে আসছে কেন? এশিয়ার চলচ্চিত্র কখনোই তেমন আলোচনায় আসেনি। সত্যজিৎ আর জাপানের আকিরা কুরুসাওয়া ছাড়া।

অঞ্জন দত্ত : চলচ্চিত্রে এশিয়া নেতৃত্বে ছিলো না সত্য। সত্যজিৎ বাংলা ছবিকে বিশ্বের কাছে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। তবে কোথাও হচ্ছে না এটা ঠিক না। এখন এশিয়া, আর্জেন্টিনা, আফ্রিকায় ভালো ছবি হচ্ছে। বিশেষ করে ইরানি ছবির কথা বলতেই হয়। সেখানে কি সব শক্তিশালী প্রোডাকশন বেরুচ্ছে চিন্তাও করতে পারবেন না। তাদের ছবিতে মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সংস্কৃতিকে আলাদাভাবে চেনা যায়। আখমল বাফের কথা বলা যায়। তার 'ফ্যামেলি' খুব ভালো ছবি। ছবির বাজেটও কম। তার মেয়ে সামিরা বাফ, সেও সুন্দর ছবি বানাচ্ছে। চীনের ওয়াং কাংওয়াই অসাধারণ ছবি বানাচ্ছে। সে তো বলতে গেলে এখনকার সিনেমার আইকন। এমনকি পাশের দেশ ভূটান, মালদ্বীপে দারুণ সব ছবি হচ্ছে। তবে আমাদের এখানে হচ্ছে না এই যা। আগে এশিয়া অনেক বেশি আমেরিকা, ইউরোপ বা ফ্রান্সমুখী ছিলো। এখন এশিয়াতেও পরিবর্তন হচ্ছে। আমি যাদের কথা বললাম এরা কিন্তু নিজেদের সময়ে দাঁড়িয়েই সুন্দর ছবিগুলো করছে। আমরা পারছি না। আমাদের গাইড এখনো সেই সত্তর দশক। এমনকি বাংলাদেশেও 'মাটির ময়না' হয়েছে। বিচ্ছিন্ন কিছু চেষ্টা যে চলছে না তা নয়। তবে ফোকাস্‌ড নয়।

২০০০ : দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, '৬০-এর দশকে দুই বাংলার নেতৃত্বে ছিলো পশ্চিম বাংলা। তারা ঐ জায়গা থেকে সরে গেছে...

অঞ্জন দত্ত : ভাই এটা তো একটা বড় আলোচনা। আমি সংক্ষেপে বলি। ঐ অবস্থান থেকে পুরো বিশ্ব সরে এসেছে। মাটির ময়নার কথা বললাম। এতো সুন্দর একটা ছবি। এই ছবিটাকে তো বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। বিচ্ছিন্ন চেষ্টা নয়, আমি সমন্বিত চেষ্টার কথা বলছি। যেমন কোলকাতায় ছবি হচ্ছে, এখানে পৌঁছাচ্ছে না। আবার এখানেরটা ওখানে। এটা একটা বিশাল সমস্যা। '৯০-এ ভালো কিছু সিনেমা হয়েছে। '৯০-এ গানটাও ভালো ফোকাসড় হয়েছে। ফলে গান একটা দৃঢ় অবস্থানে। সিনেমায় সেটা হয়নি। দেখেন, বাংলাদেশ বা পশ্চিমবাংলায় সিনেমার প্রযুক্তি আধুনিক নয়, সিনেমার দাম বেড়েছে কিন্তু ভালো গল্প নেই। সিনেমা এখন গ্লোবালাইজড্। সিনেমা থেকে আঞ্চলিকতা চলে যাচ্ছে। পাশাপাশি বিশ্বায়নের চাপ। এর সঙ্গে সবকিছু বাণিজ্যের তালিকায় ঢুকে গেছে বা যাচ্ছে। এসব বিস্তর সমস্যা অস্বীকার করতে পারবেন না। এ চাপ সহ্য করতে পারছে না টালিগঞ্জ বা বাংলাদেশের ছবি। যার ফলে সবাই এখন হিন্দিমুখী। হিন্দি ছবির বাজেট বেশি, চকচকে সেট, ফ্যাশন্যাবল নায়ক-নায়িকা সব বাণিজ্যের জন্য। আবার দেখুন, সত্যজিৎ তার গ্রামীণ জীবন দেখিয়েই বিশ্ব চলচ্চিত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলো। আমার কাছে সিনেমা বা সাহিত্য বা গান শুধু বাণিজ্যের ব্যাপার নয়। তারচেয়েও বেশি কিছু। অর্থ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তবে সবকিছু নয়। বাণিজ্যের প্রসঙ্গ এলো। একটা উদাহরণ দিই। চোখের বালির কথা ধরুন।

২০০০ : হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি। ছবিটাতে উপন্যাসের সেই পরিবেশটা নেই যেন। ঐশ্বরিয়ার চেহারা কিন্তু বাঙালিকে প্রতিনিধিত্ব করে না...

অঞ্জন দত্ত : করে না তো। মূল ব্যাপার হলো অর্থ। সেটাই বলি শোনেন। ঋতুপর্ণ ঘোষ আমার ভালো বন্ধু। ভালো পরিচালক। তার মতো পরিচালককে 'চোখের বালি'তে ঐশ্বরিয়া নিতে হবে কেন? কারণ বাণিজ্য। ছবি নির্মাণ অনেক ব্যয়বহুল। টাকা তো উঠে আসতে হবে। ছবি বিক্রির জন্য শুধু ঐশ্বরিয়াকে দরকার হচ্ছে। ঐশ্বরিয়ার কণ্ঠ ডাব করছে শীলা মজুমদার। শিলা মজুমদারকে দিয়ে চোখের বালি বেঁচা যাচ্ছে না। তাই শীলাকে দিয়ে ডাব করানো হচ্ছে, এর কোনো মানে হয় না। এ জায়গায় আপস করতে হচ্ছে। এতে বাঙালি তার স্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছে। আমি বলি, এখান থেকে বেরুতে হবে। সত্যি বলতে কি, আমরা বিশ্বায়নের নামে এতো বাণিজ্যিক হয়ে যাচ্ছি, আমাদের মানবিকতাই বিক্রি হতে চলেছে। প্রকট এ চাপ আমরা মোকাবিলা করতে পারছি না। আগে বিভিন্ন রকম সামাজিক, সাহিত্যকেন্দ্রিক আন্দোলন ছিলো। যেগুলো আমাদের মানবিক আর মানুষ হতে শেখাতো। আমার মনে হয় জীবনের অনেক মূল্যবান কিছু বোধ, সংস্কৃতির নৈতিক জায়গাগুলো কলাপস করেছে। আগে টালিগঞ্জের ছবি পশ্চিমবঙ্গ থেকে তার দর্শক খুঁজে নিতো। এখন সেটা পারছে না। কিন্তু বাঙালি তো শুধু কোলকাতা নয়, সারা বিশ্বেই আছে। বিশ্ব বাঙালিদের জন্য ছবি বানালে বাংলা ছবির মার্কেট ভালো হবেই। পরিবেশনের নীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলা ছবি ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য তো নতুন নীতি হয়নি। এটাকে নতুন করে অর্গানাইজ করা গেলে ভালো হয়। এখন লন্ডনে যে হলে শাহরুখের ছবি দেখাচ্ছে, সেখানে যদি অঞ্জন দত্তের ছবি দেখানো হয় তাহলে হবে কি করে? সুতরাং বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন দরকার।

২০০০ : বাংলা ছবির বিশ্বায়ন তো আন্তর্জাতিকতার ব্যাপার...

অঞ্জন দত্ত : রুচির জায়গায় বাঙালি কিন্তু প্রথম থেকেই আন্তর্জাতিক। বাঙালির কিন্তু বিশ্বসাহিত্য, নাটক, সিনেমা বা চারুকলার সঙ্গে যোগাযোগটা দীর্ঘ। এভারেজ পাঞ্জাবি বা মারাঠির মধ্যে এটা ছিলো না। বাঙালির রুচি আন্তর্জাতিক হলেও সে মানসিকভাবে সব সময় বাঙালি ছিলো।

২০০০ : দুই বাংলার যৌথ উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য ছবি 'পদ্মা নদীর মাঝি'। এখন এমনটি হচ্ছে না কেন?

অঞ্জন দত্ত : আমার মনে হয় এই উদ্যোগটি ছিল অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যে পদক্ষেপে সফল হয়েছিল 'পদ্মা নদীর মাঝি'। এ পদক্ষেপটি কেন যে থেমে গেল জানি না। এমনটি হলে দুই বাংলার জন্যই ভালো হতো। এখানে সরকারি চালাকি হয়তো অন্তরায়। উদ্যোগটা গানে রয়েছে। এটাকে একটু ভালোভাবে অর্গানাইজড করলে আরো ভালো হতে পারে। 'মাটির ময়না', 'জয়যাত্রা' ঢাকায় চলল, আবার কলকাতায় চালালে ভালো হয়।

'বউ-শাশুড়ির ঝগড়া আমাদের সংস্কৃতি নয়। সনির, জিটিভির সিরিয়াল যখন চলে তখন তো মেয়েদের টিভির সামনে তোলা দুঃসাধ্য। তো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রুখতে হবে আপনার নিজস্ব সংস্কৃতি দিয়ে। সে জায়গায় আমরা ব্যর্থ'

২০০০ : সিনেমার কথা অনেক হলো। এ দেশে আপনার পরিচয়, আপনি গায়ক অঞ্জন। আপনার গানে অনেক বেশি নগর আর নস্টালজিয়া। আবার একজন হরিপদ বা চকলেট বিক্রেতা বালকও উপস্থিত। অর্থাৎ সামাজিক অসঙ্গতি...

অঞ্জন দত্ত : আমি এখানে অস্বীকার করছি না যে আমি গানের লোক। তারপরেও বলবো, আমি সিনেমার লোক। আমার সৌভাগ্য যে বাংলাদেশের মানুষের কাছে আমি গানের মধ্যে পৌঁছেছি। আমি নগরের মানুষ, তাই গানে ঘুরে ফিরে কোলকাতা এসেছে। কোলকাতা আমার প্রিয় শহর। মানুষ তো স্মৃতিকাতুরে। তাই হয়তো নস্টালজিক মনে হয়েছে। আমি গানে চারপাশের গল্প বলি। আমার নিজের গল্প। গান আমার কাছে কবিতা নয় গল্পের মতো। সব গল্পের একজন নায়ক-নায়িকা বা চরিত্র থাকে। আমার গানেও এটা হয়েছে। হরিপদ কেরানিরা, চকলেট বিক্রেতা তো আমার-আপনার পাশেই আছে। এরা তো বিচ্ছিন্ন কেউ নয়। এদের জীবন আমাদের কোনো না

কোনোভাবে প্রভাবিত করে। আমার গানে সে জন্য চরিত্র হিসেবে চায়ের দোকানের বালক, একজন বুড়ো মানুষ বা স্যামসনের মতো মানুষগুলো উঠে আসে। আমি একটা পুরনো পাড়ায় থাকি। সেখানেই এসব মানুষের অবস্থান।

২০০০ : শ্রেণীগতভাবে আপনি তো ঐ শ্রেণীতে নেই...

অঞ্জন দত্ত : প্রশ্নটা শ্রেণীর নয়, দেখার। গান, সিনেমা করি বলে আমার নিজস্ব একটা পরিচয় হয়েছে। কিন্তু আমি তো সেই পাড়াতেই আছি। এখানে যারা থাকে তাদের নিয়েই তো আমার বসবাস। আমি এদের সঙ্গে কথা বলি। এদের জানার চেষ্টা করি। আমার মতো ওরাও এই নগরের অংশ। আমার দুঃখ-কষ্ট আর যন্ত্রণা কিন্তু শ্রেণীগতভাবে আলাদা নয়। বরং নাগরিক যন্ত্রণা সমান। এজন্যই হয়তো ওরা আমার গানের প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠে।

২০০০ : আপনার গানে 'রাস্তার পাশে সস্তা হোটেলে বদ্ধ কেবিনে বন্দী দুজনে' প্রেমিক-প্রেমিকার নির্জনতা উঠে এসেছে। কিছু পরে হারানোর শঙ্কা একজন বেলা বোসকে পাওয়ার জন্য কি আকুতি আপনার! এই বেলা কে, তার গল্প কি বলবেন?

'ফ্রেমে বাঁধা কিছু করতে চাইনি। গান যখন করেছি তখন সেটা ভিন্ন ধারার গান। আমি যদি শুধু ভোকালিস্ট হতাম তাহলে আমাকে কিন্তু বাজে গান করতে হতো। গান আমার কাছে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের জায়গা। এটাই আমি শ্রোতাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চেয়েছি। এ ব্যাপারে সম্ভবত সফল। মানুষ আমার কথা শুনছে এবং শুনতে চাইছে'

অঞ্জন দত্ত : বেলা বোস একটা গল্প। স্রেফ গল্প। বাস্তবে এই বেলার কোনো অস্তিত্ব নেই। বেলার প্রতি যে আকুতি তা তো সব যুবকেরই থাকার কথা। বাংলা উপন্যাসে দেখেননি নায়ক বেকার। তার কি যন্ত্রণা। নায়ক যখন নায়িকাকে পায় না তখন তার জীবনে সস্তা হোটেল, ভুল বানানে লেখা চিঠি, বদ্ধ কেবিন কিংবা দুরু দুরু বুকে প্রেয়সীর হাত স্পর্শ করার স্মৃতিটাই জীবন্ত হয়ে ওঠে।

২০০০ : বাস্তবে না থাকলে গানে এতোটা আকুতি সৃষ্টি সম্ভব? কিংবা মালার কথা ai"b। **কে মালা? স্বপ্নের ভেতরে সে কোথায় যায় তার সন্ধান করেন। তাকে ভালোবাসেন আবার সিঁড়ি ভেঙে উপরে ওঠে যাওয়াকে ব্যঙ্গও করেন।**

অঞ্জন দত্ত : বাস্তবের বেলা আসলেই কেউ নয়। এমন প্রশ্নের সম্মুখীন আমি অনেক হয়েছি। আচ্ছা একটা উপন্যাস পড়ে কি আপনার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না? বেলা গানটা জনপ্রিয় হয়েছে। জানেন গানটা আমার খুব একটা পছন্দের নয়। মালা বা বেলা বোস যার কথাই বলেন, তাদের তো আমরা নিজের চারপাশেই দেখি। এদের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। হয়তো একজন প্রেমিকের কষ্ট বা ঈর্ষা আমি বুঝতে পারি, যেটা আমি গানে তুলে এনেছি।

২০০০ : আপনার গানে রমা, রঞ্জনা, মেরিয়েন, দেবলীনাদের মতো সুন্দর সব নারীর জীবন্ত উপস্থিতি। রমার মতো দৃঢ় ব্যক্তিত্বের মেয়ে আপনার সত্য বলার সৎ সাহস দেখে বাড়ি ছাড়ছে বাবা-মার কলঙ্ক হবে জেনেও। মালার জন্য ওভাররয় ভাইদের দরজা খোলা, ইমরান খান তার বাড়িতে কফি খেতে আসছে, আবার তার একজন স্বামী আছে যে বিদেশে থাকে। ভিন্ন দুই চরিত্রের নারী আপনার গানকে প্রভাবিত করে... সুরের মতো মিষ্টি, কল্পনার আবির ছড়ানো এসব নারী কোথায় বাস করে। পাঠকদের বলেন না প্লিজ...

অঞ্জন দত্ত : ভালো বলেছেন। সত্যি এরা আমার কল্পনায়, গল্পে বাস করে। এরা আপনাদের কাছে সুন্দর কারণ আপনার কল্পনায় এই নারীটি আছে। লক্ষ্য করবেন, আমার গানের নায়িকারা সবাই কিন্তু সাধারণ। এরকম সাধারণ নারীকে নিয়েই তো আপনার স্বপ্ন সুরের মতো মিষ্টি হয়। আরো একটা ব্যাপার হলো, এ গানগুলো জনপ্রিয় হবার পেছনে মানুষের কমন সাইকোলজি কাজ করেছে। একজন যুবক হয়তো এ রকম একটা গল্প বলতে চাচ্ছে। কিন্তু পারছে না। সেটা আমার গানে উঠে এসেছে। রমা বা মালা আমাদের চারপাশে অনেক আছে। খুঁজে দেখুন ওরা আলাদা কোনো সত্তা নয়, এই সমাজেই তারা বিদ্যমান। আমার কল্পনার রসদ তো সমাজ থেকেই পাই তাই না?

২০০০ : 'তুমি আসবে বলে তাই, আমি স্বপ্ন দেখে যাই'- খুব জনপ্রিয় গানের একটা। কে আসবে, কাকে নিয়ে স্বপ্ন, কার জন্য সুখে আগুন জ্বালানো?

অঞ্জন দত্ত : এটা আসলে লিখে ফেলেছি আর কি? চেষ্টা করছিলাম ব্যালড থেকে বের হতে। এটা একটা ইংলিশ গানের অনুকরণে করা। গানটি ভালো। গানে 'তুমি'র তো অনেক ব্যাখ্যা হয়। প্রেমিকা, মা, দেশ, স্বাধীনতা যা বলেন। সত্যিই বলতে আমি তো চেনা জানা গল্প নিয়ে গান লিখি। এর বাইরে কি মানুষ যেতে পারে?

২০০০ : আপনার আরেকজন নায়িকা নিয়ে প্রশ্ন না করে পারছি না। অনেকের ধারণা আপনার গানে যত নারী এসেছে, তার মধ্যে মেরিয়েন আপনার সত্যিকার প্রেমিকা ছিলো। আপনার মতো তারও বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে, টাইপরাইটারে তার আঙুল ক্ষয়ে গেছে, সেটা আপনি এখনো লক্ষ্য রেখেছেন। এই মেরিয়েন কে? নাকি বৌদির ভয়ে বলবেন না?

অঞ্জন দত্ত : আমি আমার জীবনে অনেকগুলো খ্রিষ্টান পরিবারের সঙ্গে মিশেছি। অনেক দিন তাদের সঙ্গে কেটেছে। মেরিয়েন এসব পরিবারেরই একজন। এসব চরিত্র আমার ভীষণ চেনা। আমি স্বীকার করছি যে মেরিয়েনরা আমার পরিচিত। আমি যে সমাজে বাস করি, আমার যে পার্শ্বিকতা সেখানের কোথাও না কোথাও এরা আছে। একজন মেরিয়েন, রমা, মালা আমার আপনার জীবনেই আছে। এ রকম অনেক গল্প আপনার বা আপনার বন্ধুর জীবনে আছে। আমার বন্ধুদের জীবনেও আছে। মন্টু-রীতার মতো বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়েই সকলের জীবন। লিখতে বসলে ওদের কথাই যে মনে হয়। জীবন সমৃদ্ধ হবার পেছনে এসব বন্ধুদের ভূমিকাও তো কম নয়। ধরে নেন ওরা ঐ সার্কেলেরই অংশ। সেজন্যই তারা উঠে এসেছে। লক্ষ্য করবেন, আমার গানে বৃষ্টির ছবি আকার দৃশ্য যেমন উঠে এসেছে; তেমনি কোলকাতা, দার্জিলিংও এসেছে।

২০০০ : হ্যাঁ, দার্জিলিংয়ের উপস্থিতি এতো কেন?

অঞ্জন দত্ত : ছেলেবেলায় দার্জিলিংয়ে একটা বোর্ডিং স্কুলে ছিলাম। সেখানেই আমার গানের হাতে-খড়ি। খুব দুষ্টু ছিলাম। দুষ্টুমির মাঝেই দার্জিলিংয়ে বেড়ে ওঠা। বলতে পারেন কম বয়সে বড় হয়ে গিয়েছিলাম। শিক্ষকরা গানে ও অভিনয়ে উৎসাহ দিয়েছেন। তাদের উৎসাহই আমাকে তৈরি করেছে। যে কারণে আমি বারবার দার্জিলিংয়ে ফিরে গেছি। আমার পরের ছবিও দার্জিলিং নিয়ে।

২০০০ : আপনি তো নগরকে খুব পছন্দ করেন আবার গালিও দেন। এই নাগরিক দ্বন্দ্ব কেন?

অঞ্জন দত্ত : আসলে নাগরিক দ্বন্দ্ব নয়। মূলত কোলকাতা শহর আমার খুব ভালো লাগে। বোম্বেকে আমি গ্রহণ করি না। সেখানে গিয়ে থাকতেও পারবো না। কোলকাতা কসমো পলিটন শহর। অনেক রূপ তার। সেটাই গানে বলেছি। তাছাড়া যখন একজনকে ভালো লাগে, তখন তার দোষ-গুণ সব মিলিয়েই। বিষয়টি এমনই। কোলকাতার মধ্যে আমি পৃথিবীটাকে পাই।

২০০০ : অনেক দিন আপনার কোনো নতুন গান নেই...

অঞ্জন দত্ত : প্রথমেই বলেছি আমি মানসম্পন্ন, রুচিসম্মত কাজ করতে চাই। অঞ্জন দত্ত যখন গান করছে, তখন গানটা কি হচ্ছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। ভালো কথা পাচ্ছি না বলে ৫ বছর ধরে গান লিখছি না। যতো দিন ভালো কথা না পাবো গান লিখবো না। গাইবো না। ঢাকায় বেড়াতে এলাম। জুলফিকার রাসেল কিছু গানের কথা বললো, শুনে ভালো লাগলো। তাই একটা ডুয়েট অ্যালবাম করছি। সঙ্গে বাপ্পা আছে। যদি কখনো ভালো লাগে তবে আবার লিখবো। সামনে একটা ছবি নিয়ে ব্যস্ত থাকবো। শেষ করার পর ভেবে দেখবো। বয়স হচ্ছে, তাছাড়া গান হচ্ছে না যখন তখন মনে হয় ফুলস্টপ টানার সময় হয়ে গেছে। বয়সের কারণেও পারছি না।

২০০০ : কত হলো? আপনি গান না গাইলে হবে কি করে?

অঞ্জন দত্ত : ৪৯। সামনে ৫০-এ পা দেবো। আর কতো দিন বাঁচবো, বড় জোর ১০ বছর? এ দশ বছর আমি সিনেমা করতে চাই। গান যদি না হয় তবে কিভাবে করবো? তেমন কথাও খুঁজে পাই না। রাসেলের মতো এমন সুন্দর কথা পেলে বছরে একটা-দুটো অ্যালবাম করতেও পারি। কিন্তু অঞ্জন দত্ত'র এখন মনে হয় থামা উচিত। কারণ সব একঘেয়ে মনে হয়। একঘেয়েমির জন্য তো আমি গান করি না। একঘেয়েমী থেকে মুক্তি পেতেই গান থেকে মুক্তি চাইছি।

২০০০ : এটা শ্রোতাদের জন্য আশাভঙ্গের, বেদনারও...

অঞ্জন দত্ত : অঞ্জনের বয়স বাড়ছে, সেই সঙ্গে মানসিকতা পাল্টাচ্ছে। সেই পরিবর্তনটা কেন শ্রোতা গ্রহণ করবে না? শ্রোতাদের রুচির পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ করা। সেটিই যদি না হলো তবে কি লাভ গান করে?

২০০০ : সুমন, অঞ্জন দত্ত, নচিকেতার পর কিন্তু তেমন কারো নাম শোনা যায় না, এর কারণ কি?

অঞ্জন দত্ত : এটা ঠিক না। হয়তো সেই ধরনের গান লেখা হচ্ছে না। কিন্তু এনার্জি নেই, কেউ চেষ্টা করছে না এটা ঠিক নয়। হয়তো তারা ধারা পরিবর্তন বা শ্রোতারা কি চায় তা বুঝতে পারছে না বলেই এ অবস্থা। এখন কেনা-বেচা নিয়ে সবাই ব্যস্ত। এখন হয়তো ফোক চলছে, সবাই ফোক নিয়ে মাতামাতি করছে। অন্যের চেয়ে ভিন্ন কিছু করবে, এই ভাবনা তাদের মধ্যে কাজ করছে না।

২০০০ : এপার বাংলায় যারা গান করছে তাদের গান তো শুনেছেন। এদের মধ্যে কাদের গান ভালো লাগে?

অঞ্জন দত্ত : আমার মনে হয় বাংলাদেশের ব্যান্ড দলগুলো ভালো করছে। ফিডব্যাক, আইয়ুব বাচ্চু, বাপ্পা, মাইলস, জেমস- এদের গান শুনেছি। আজম খান পরে শুনেছি। তবে আমার ছেলে নীল অনেক খোঁজখবর রাখে।

২০০০ : রিমিক্স গানগুলো গানের জন্য কতোটুকু মঙ্গল?

অঞ্জন দত্ত : রিমেক বা রিমিক্স গান অবশ্যই গানের জন্য অমঙ্গলকর। নতুন গান না হলে নতুন গীতিকার, সুরকার সৃষ্টি হবে না। এক কথায় বলা যায় যে, গানগুলো পুরনো জায়গাতেই ঘুরপাক খেতে হবে। এছাড়া পুরনো গানগুলো যেভাবে রঙ মেখে পরিবেশন করা হচ্ছে, তাতে সেসব গানের আরো বারোটা বাজানো হচ্ছে।

২০০০ : আপনার বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে। আপনার পরিচিতি ভারতীয়। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় ফিল্ম, এখন যে ছবি দেখছি, সেই ছবি সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

অঞ্জন দত্ত : আমি ন্যাশনালি ভারতীয়। কিন্তু মানসিকতায় বাঙালি। আমি যদি হিন্দি ছবিও করি, সেটা বাংলার জায়গা থেকে ভাবা হবে। সেটা হবে কোলকাতার। বর্তমানে বলিউডে যে সমস্ত ছবি হচ্ছে এটাকে আমি সাপোর্ট করি না। তবে আমি এমন এক ধরনের ছবি করতে চাই যেটা ভারতীয় ছবি। অডিয়েন্সের কাছে ভারতীয় ছবি হিসেবেই যাবে। একটা পাঞ্জাবি বিয়েবাড়ির গল্প, গান-বাজনা শেষে মিলন এটা ভারতীয় সিনেমা হতে পারে না। সিনেমা দেখে মনে হয় ভারত মানেই এমন। আসলে ভারত মানে এটা নয়। ভারত মানে কেরালা, কোলকাতা, উড়িষ্যা অনেক জায়গা।

২০০০ : এপার ওপার এই দুই বাংলার ফিল্মের সম্ভাবনা নিয়ে কিছু বলবেন কি?

অঞ্জন দত্ত : এখানে মানসম্পন্ন ছবি হচ্ছে, তা যদি আমাদের কাছে পৌঁছে; আবার আমাদের ভালো ছবি এখানে পৌঁছালে দু'দেশেরই লাভ। শুধু এপারের শিল্পী ওপারে বা ওপারের শিল্পী এপারে এভাবে সিনেমার উন্নয়ন সম্ভব নয়। 'মাটির ময়না' ওপার বাংলায় দেখানো হলো আবার 'আমার ভুবন' এপারে দেখানো হলো- এটা হওয়া দরকার। গান সহজেই পৌঁছে গেছে। এপারের শিল্পীদের গান আমাদের কাছে পৌঁছায়, আবার একই ঘটনা আমাদের ক্ষেত্রেও। এতে শ্রোতা পাচ্ছি।

২০০০ : এখন বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতবর্ষসহ আমাদের দেশে যে সাংস্কৃতিক দীনতা চলছে, এ বিষয়ে আপনার ভাবনা কি?

অঞ্জন দত্ত : সংস্কৃতি এখন রপ্তানির ব্যাপার। টিভিতে আমরা সংস্কৃতির আগ্রাসন দেখছি। এ জন্যই বলছি টিভি দেখো না। আগে বাঙালি তার রুচিতে আন্তর্জাতিক ছিলো। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালি অন্তরে আন্তর্জাতিক। সে রবীন্দ্রনাথ পড়েছে যেমন, তেমনি বিটলসের গান শুনেছে। ব্রেখটের নাটক দেখেছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আমাদের জীবন থেকে রবীন্দ্রনাথসহ সব কেড়ে নিচ্ছে। জিটিভি, সনি ভীষণ গ্রাম্য, বস্তাপচা গল্প দিয়ে আমাদের ড্রয়িংরুমে আটকে ফেলছে। বউ-শাশুড়ির ঝগড়া আমাদের সংস্কৃতি নয়। সনির, জিটিভির সিরিয়াল যখন চলে তখন তো মেয়েদের টিভির সামনে তোলা দুঃসাধ্য। তো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রুখতে হবে আপনার নিজস্ব সংস্কৃতি দিয়ে। সে জায়গায় আমরা ব্যর্থ। ফলে ভারতীয় ফিল্ম বা নাটকে আপনি যা দেখছেন তা আপনাকে পেয়ে বসছে। এটাই বিশ্বায়নের ফল। সংস্কৃতি একটি জাতি হাজার বছরের চর্চার মধ্যে লালন করে। মানুষের অন্তরে লালন করা এই জিনিসটির এখন আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি হয়েছে। এটা ঐ বাণিজ্যওয়ালারা করেছে। এই দীনতা থেকে আমাদের বেরুতে হলে নিজেদের সংস্কৃতি চর্চায় আরো মনোযোগী হতে হবে। তা ছাড়া কোনো উপায় নেই। দেখেন, আপনারা যে বাংলা চ্যানেল দেখেন সেটা কিন্তু হায়দ্রাবাদ থেকে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং আপনি আলফা বাংলায়, বাঙালি সংস্কৃতি কিভাবে দেখবেন। আবার সরকারি নীতির কারণে আপনাদের চ্যানেলগুলো ওপারে বন্ধ। এটা চালু করা গেলে ভালো হতো।

'আমরা নিজেদের ক্রইসিসটাকেই ফোকাস করতে পারছি না। যদি করতে পারি তবে আমরা ভালো ছবি নিশ্চয়ই বানাতে পারবো। কিন্তু সমস্যা কি জানেন? আধুনিকায়ন আর বিশ্বায়নের নামে আমরা নিজেদের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের জায়গা ভেঙে ফেলেছি। এখন আমরা কনফিউজড্'

২০০০ : আপনি ভবিষ্যতে সঙ্গীত, চলচ্চিত্র পরিচালক না অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চান?

অঞ্জন দত্ত : আমি চিত্রপরিচালক হিসেবেই কাজ করতে চাই। আমি নিজে ভালো গান লিখতে পারছি না বলেই গান করছি না। আমি সিনেমার লোক, সিনেমাতেই থাকবো। সেখানে যদি গানটাকে ঢোকানো যায় সেটা ভালো। কিন্তু বাকি জীবন সিনেমাই করবো।

ছবি : **তুহিন হোসেন**